গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা | ১৪ - ২০ জুলাই ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক

কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার আর একটি মৌলিক ‘ইনজাস্টিস’-এর (অবিচারের) দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। দুশো-পাঁচশো বছর আগে, পুঁজিবাদ বিকাশের আগে মানুষের শ্রমশক্তির চরিত্র কী ছিল? লোকে পরিশ্রম করত নিজের ভোগের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করার জন্য। আর খানিকটা বাড়তি উৎপাদন করত— তাও নিজের ভোগের উদ্দেশ্যেই বিনিময় করার জন্য। মানে সাধারণ মানুষের উৎপাদন শক্তির মালিকানা, শ্রমশক্তির মালিকানা তাদের নিজেদের হাতেই ছিল। আর

দুয়ের পাতায় দেখুন

শুধু দল বদলে হবে না
রাজনীতি বিচার করা চাই

এই নাকি গণতন্ত্রের উৎসব!

কোথায় উৎসব? কোথায় গণতন্ত্র? এ তো গণতন্ত্রের শবযাত্রা! শুধু ভোটের দিনেই ১৮টি প্রাণ বলি হল। পুরো ভোটপর্বে মৃত্যু হল ৪৩ জনের। ফলপ্রকাশ ও বোর্ডগঠন পর্বে আরও কত প্রাণ যাবে, তা কেউ বলতে পারে না। ভোটের সারা দিন ধরে চলল আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ, বুথ দখল, বুথ জ্যাম, ছাপ্পা ভোট, ব্যালট বাক্স ছিনতাই। নির্বাচন কমিশনের পাহাড়প্রমাণ নিষ্ক্রিয়তা, পুলিশ-প্রশাসনের চরম দলদাসত্ব, শাসক দলের পরিকল্পিত সন্ত্রাস— সব মিলিয়ে নির্বাচনের নামে একটি প্রহসন হয়ে থাকল ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন।

পঞ্চায়েত নির্বাচন

এ জিনিস যে হতে চলেছে ভোট ঘোষণার পর থেকেই তা অনুমান করা যাচ্ছিল। কোনও প্রশাসনিক প্রস্তুতি ছাড়াই নির্বাচন কমিশনের আচমকা ভোট ঘোষণা, শুরু থেকেই মনোনয়ন পেশে শাসক দলের বাধা, মনোনয়নপত্র কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলা, মারধর করা, নির্বাচন কমিশনের নির্বিকার মনোভাব, কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইতে গড়িমসি, পুলিশ, প্রশাসনের অসহযোগিতা, রাজ্যপালের অন্তঃসারশূন্য ঢক্কানিনাদ— এই সব কিছুই বলে দিচ্ছিল এবার ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচন বা তার আগের নির্বাচনগুলিরই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে।

অথচ বক্তৃতায় শাসক তৃণমূলের নেতারা বারবার গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ভোটের আশ্বাস দিয়েছিলেন। মনোনয়নে কাউকে বাধা দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করেছিলেন। সে-সবই যে নিছক কথার কথা ছিল, ভেতরে তাঁরা যে অন্য পরিকল্পনা সাজাচ্ছিলেন, গোটা পর্বে তা স্পষ্ট। কিন্তু রাজ্য সরকারের অজস্র ‘শ্রী’-তে দেদার খয়রাতি, ‘নব জোয়ারের’ ভিড় দেখে নেতাদের মুহুর্মুহু বিস্মিত হওয়ার পরও শাসক তৃণমূলকে এমন সন্ত্রাসের পথ নিতে হল কেন? তবে কি তাঁরা ভয় পাচ্ছিলেন যে, তাঁদের উঁচু থেকে নিচু তলা পর্যন্ত নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে পাহাড়প্রমাণ অভিযোগ উঠেছে তাতে তাঁদের বিরুদ্ধে ভোটবাক্সে জনমতের বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে? আর সেই জনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে

দুয়ের পাতায় দেখুন

নির্বাচন না প্রহসন
টিএমসি-র সন্ত্রাস
সিপিএমের পরম্পরায়

সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৮ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের পরিকল্পিত নিষ্ক্রিয়তা এবং রাজ্য পুলিশের সচেতন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সক্রিয়তায় পঞ্চায়েত নির্বাচন পুরোপুরি প্রহসনে পরিণত হয়েছে। পুলিশ এবং কমিশনের চোখের সামনেই শাসক দলের হয়ে সমাজবিরোধীরা বোমাবাজি করে, গুলি চালিয়ে মনোনয়ন পর্ব থেকে শুরু করে ৪৩ জনকে হত্যা করেছে। ছাপ্পা ভোট দেওয়া, এক ঘণ্টার মধ্যে

দুয়ের পাতায় দেখুন

কুলতলীতে গুলিবিদ্ধ ১১ এসইউসিআই(সি) কর্মী

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় কুলতলীর মেরিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হোড়খালি গ্রাম সভা ৩-৪ নম্বর বুথে সকাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছিল। হঠাৎ কুলতলী থানার আইসি স্কুলের ছাদে উঠে ফাঁকা ফায়ারিং করেন। এই ইশারা পেয়ে টিএমসির দুষ্কৃতীরা বুথে ঢুকে ছাপ্পা মারতে শুরু করে। চার নম্বর বুথের এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী আলপনা সরদার জানান, পুলিশ সকাল ১১ টার সময় ব্যালট বক্স নিয়ে পালিয়ে যায়।

গুলিবিদ্ধ এসইউসিআই(সি) কর্মীরা

পাশের বুথের এক প্রার্থী বলেন, দুটো বুথ পুলিশের সহযোগিতায় দখল করে নিয়েছে টিএমসি-র দুষ্কৃতীরা। তারপর মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হলে ব্যাপক গোলাগুলি চলে। দু'জন মহিলা সহ ১১ জন এস ইউ সি আই (সি) কর্মী গুলিবিদ্ধ হন। এঁরা সকলেই ক্যানিং ও কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

মণিপুরের আগুন নেভাতে চান না বলেই কি প্রধানমন্ত্রী নীরব

ভারতের প্রধানমন্ত্রী কি মণিপুর রাজ্যটার কথা জানেন? প্রধানমন্ত্রী এমনকি দিল্লিতে বসেও মণিপুরের একাধিক প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করার জন্য পাঁচটা মিনিটও সময় দেননি। তাঁর ‘মন কি বাত’-এ ‘মণিপুর কি বাত’ একেবারে শূন্য। না হলে ৩ মে থেকে সে রাজ্যের মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায়ের মানুষের অবিরাম দাঙ্গা, রক্তপাত, মৃত্যু দেখে তিনি এত নির্বিকার থাকতে পারেন কী করে?

একটা ছোট্ট রাজ্যে দু'মাসের বেশি সময় ধরে চলা দাঙ্গায় কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছেন তার সঠিক হিসাব কেউ রেখেছে কিনা সন্দেহ। সরকারি হিসাবে তা প্রায় দেড়শোর ঘরে। ৬০ হাজারের বেশি নিরাশ্রয়। দুই সম্প্রদায়ের ঘৃণা এবং বিদ্বেষ কতটা তীব্র হতে পারে তার একটা নজির বোধহয় সাত বছরের বালক তনসিং হ্যাংসিং ও তার মা এবং এক প্রতিবেশী মহিলাকে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যেই পুড়িয়ে মারার ঘটনা। তনসিংয়ের বাবা কুকি, মা মেইতেই। অথচ দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষের বলি হয়েছে

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

একের পাতার পর

আজ যারা খেটে খান— ‘ইনটেলেকচুয়াল’ শ্রমিকই (বৌদ্ধিক শ্রমজীবী) হোন, অথবা যাঁরা কায়িক শ্রম করেন তাঁরাই হোন, কৃষক-মজুরই হোন, আর প্রফেসরই হোন— তাঁদের শ্রমশক্তির মালিক তাঁরা নন। তাঁদের শ্রমশক্তি আজ পুঁজিবাদী বাজারের পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁদের শ্রমশক্তির মালিকানা আজ মালিক শ্রেণির হাতে— মালিকরা কেনে-বেচে, শর্ত দেয়, সেই অনুযায়ী শ্রমিক শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে সাধারণ মানুষের শ্রমশক্তির চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে কী? না, তারা নিজের জন্য আর পরিশ্রম করে না। উৎপাদনের মধ্যে তাঁদের পরিশ্রম ‘এমবডিড’ (মিশে) আছে। সেই অর্থে সাধারণ মানুষের শ্রমও আজ সামাজিক হয়ে গেছে। তার চরিত্র সামাজিক। মালিকরা যে উৎপাদন করে তা কি নিজে ভোগ করার জন্য করে? না, বাজারে বিক্রির জন্য করে। অর্থাৎ মালিকরা এ সমাজে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করে। যদিও মালিকরা প্রকাশ্যে বলে, উৎপাদন হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য, অর্থাৎ সমাজের প্রয়োজনেই নাকি উৎপাদন। তা হলে উৎপাদনের চরিত্র আজ আমাদের দেশে— জমির ফসলের ক্ষেত্রেই হোক, আর শিল্প-কলকারখানার ক্ষেত্রেই হোক— হয়ে গেছে সামাজিক। উৎপাদনের চরিত্র হয়ে গেছে সামাজিক। তাই উৎপাদন যারা করেন সেই শ্রমশক্তির চরিত্রও হয়ে গেছে সামাজিক। অথচ উৎপাদনের মালিকানা রয়ে গেছে ব্যক্তিগত। এই যে উৎপাদন ও শ্রমশক্তির চরিত্র সামাজিক, আর মালিকানার চরিত্র ব্যক্তিগত— এই হল এই সমাজের মূল অসামঞ্জস্য এবং সামাজিক অন্যায়-অবিচারের মূল বুনিয়াদ। আর এই যে ‘প্রাইভেট রাইট অব এক্সপ্রোপ্রিয়েশন’ (আত্মসাৎ করার ব্যক্তি অধিকার), অর্থাৎ সামাজিক শক্তি থেকে উদ্ভূত সম্পদকে ব্যক্তির আত্মসাৎ করার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার, সেই অধিকার রক্ষা করাই হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলার কাজ। তাই আমি বলি, আমাদের সমাজে যে আইন-শৃঙ্খলার কাঠামো তার মূল বুনিয়াদ হচ্ছে এই ‘সোস্যাল ইনজাস্টিস’ (সামাজিক অবিচার)। অর্থাৎ আমাদের দেশে যে ন্যায়বিচারের ধারণার ওপর ভিত্তি করে আইন-শৃঙ্খলার কাঠামো প্রতিষ্ঠিত, তা মূলত এই সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। শ্রমের চরিত্র সামাজিক, শ্রমিক সমাজের জন্য কাজ করে, উৎপাদন সমাজের জন্য হচ্ছে, অথচ মালিকানা ব্যক্তিগত। আর সেই ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারকে রক্ষা করার নাম হল আমাদের দেশে আইন-শৃঙ্খলার বুনিয়াদী নীতি। এ কি ন্যায়বিচারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে? না, সামাজিক অন্যায় অবিচারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে?

১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা ও গণমুক্তির সমস্যা

রাজনীতি বিচার করা চাই

একের পাতার পর

ক্ষমতার দখল নিতেই কি এই সন্ত্রাস, এই দখলদারি?

এ বারের পঞ্চায়েত নির্বাচন দেখিয়ে দিল, সিপিএম আমল থেকে বিরোধীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার যে ট্র্যাডিশন শুরু হয়েছে, তা-ই তৃণমূল শাসনে সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিয়েছে। বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েতের যে সূচনা সিপিএম নেতারা করেছিলেন, যার জন্য বিরোধী প্রার্থীদের হুমকি দেওয়া, মারধর করা, বাড়িতে সাদা থান পাঠানো, ফসল নষ্ট করা, পুকুরে বিষ ঢেলে দেওয়া, ভোটের দিন বুথ জ্যাম, ছাপ্পা, বিরোধী এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেওয়া, খুন করা— সন্ত্রাস তৈরির সব পদ্ধতিই অনুগত ছাত্রের মতো রপ্ত করে নিয়েছে তৃণমূল। করবে না-ই বা কেন? শাসক তৃণমূলের একটা বড় অংশই তো পূর্বতন শাসক দলের ‘ইলেকশন মেশিনারিতে’ হাত-পাকানো ওস্তাদরা।

বাস্তবিক, গোটা পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্বটিতে জনস্বার্থের দাবিগুলি উপেক্ষিতই থেকে গেল। গ্রামীণ মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নাকি পঞ্চায়েতের সূচনা হয়েছিল। কোথায় মানুষের ক্ষমতায়ন? প্রাপ্য অধিকার তো বটেই, মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতাটুকুও আজ শাসকের কবজায়। পঞ্চায়েতগুলি আজ দুর্নীতির এক-একটি আখড়া। যখন যে যেখানে ক্ষমতায় থেকেছে সে-ই দুর্নীতিতে ডুবেছে। দরিদ্র মানুষের জন্য বরাদ্দ টাকা নির্বিচারে আত্মসাৎ করতে এদের কারওরই এতটুকু বাধেনি। নীতিহীন, আদর্শহীন, আত্মসর্বস্ব রাজনীতি আজ পঞ্চায়েতকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছে। তাই ভোটের প্রচারে তথাকথিত বিরোধীদের মধ্যেও জনস্বার্থের কথা নেই, শাসকের দুর্নীতির বিকল্প কোনও পরিকল্পনা নেই। পরিবর্তে কার দুর্নীতি বেশি, কার দুর্নীতি কম সেই তরজাই প্রধান হয়ে উঠেছে। এর কারণ শাসক-বিরোধী ভোটসর্বস্ব সমস্ত দলগুলির ইতিহাসই কালি মাখানো।

রাজ্যে ’৭২ সালে কংগ্রেস শাসনে ভোটের নামে প্রহসনের কথা প্রবীণদের এখনও স্মরণে আছে। বামপন্থার ঝান্ডা ওড়ানো সিপিএম শাসনের সন্ত্রাসের কথা মানুষ ভুলতে পারেনি শুধু নয়, একটা বিরাট অংশের মানুষের মনে তা বামপন্থা সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি করে দিয়েছে। এ বারও কংগ্রেস, বিজেপি, আইএসএফের সঙ্গে ঘোষিত-অঘোষিত নীতিহীন জোট মানুষের মনে তাদের রাজনীতি সম্পর্কে অবিশ্বাসকেই আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ত্রিপুরায় গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম-তৃণমূলের মতো বিজেপিও বিরোধীদের অংশ নিতেই দেয়নি। রাজ্যের এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাই দেখা গেল, বিরোধীরাও যে যেখানে পেরেছে সেখানেই ছাপ্পা দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই দলগুলির মধ্যে নীতিগত কোনও পার্থক্যই রাজ্যের মানুষ খুঁজে পায়নি।

স্বাভাবিক ভাবেই জনসাধারণের মনে এ প্রশ্ন বারবার ধাক্কা দিচ্ছে যে নির্বাচনের নামে এই নীতিহীন রাজনীতির, সন্ত্রাসের রাজনীতির শেষ কোথায়? একের পর এক নির্বাচন আসবে, সন্ত্রাসের রাজনীতিই কি ক্রমাগত শক্তিশালী হতে থাকবে? দল বদলায়, পতাকার রঙ বদলায়, সন্ত্রাসের রাজনীতি তো কই বদলায় না!

এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে হলে আজ এটা নিঃসংশয়ে বুঝতে হবে যে, তথাকথিত বিরোধী দলগুলি চরিত্রে যেহেতু সবাই কমবেশি একই, সকলেই নীতিহীন, সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই এই দলগুলির একজনের পরিবর্তে আর একজনকে নির্বাচিত করে এই সন্ত্রাসের রাজনীতিকে পরাস্ত করা যাবে না। ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ আজ পচে গিয়েছে। চরম নীতিহীন, দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সরকারি বা বিরোধী, যে দলই এই দুর্নীতিগ্রস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সেবা করবে, তারা নীতিহীন, দুর্নীতিগ্রস্ত না হয়ে পারে না। তাই নীতিহীনতা, আদর্শহীনতাই আজ এই রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় রাজনীতিতে নীতির চর্চাকে, আদর্শের চর্চাকে শক্তিশালী করা। কিন্তু তা আজ আর এইসব বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া কিংবা বামপন্থার আলখাল্লা গায়ে জড়ানো কোনও দলের পক্ষেই সম্ভব নয়। তা সম্ভব একমাত্র একটি যথার্থ মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলের দ্বারা, যে দল দুর্নীতিগ্রস্ত, শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে বিরামহীন সংগ্রাম করে চলেছে। ভারতবর্ষে সেই দল একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট), কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় একমাত্র এই দলটিই আজ একমাত্র জনস্বার্থে সংগ্রাম করে চলেছে। এই রাজনীতিই আজ ছাত্র-যুব সমাজকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করছে।

নির্বাচন চলে যাবে। অতীতের মতো এবারও নতুন নতুন পঞ্চায়েত বোর্ড গঠিত হবে। আবারও দুর্নীতির স্রোত বইতে থাকবে। পঞ্চায়েত বাবুরা কেউ সাইকেল ছেড়ে বাইক চড়বেন, কারও কুঁড়েঘর জাদুবলে প্রাসাদ বনে যাবে। আরও পিছনে চলে যাবে গ্রামের উন্নয়ন, গ্রামবাসীর জীবিকার সুরক্ষা, দরিদ্র মানুষের আর্থিক সক্ষমতার বিষয়টি। গৃহহীন মানুষের মাথার উপর চালের জোগাড়টুকুর সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হবে। দরিদ্র বিধবা সামান্য ভাতাটুকু থেকে বঞ্চিত হবেন।

মানুষ কাজ খুঁজতে ছুটবেন দূর রাজ্যে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, অশিক্ষা, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর উদ্বেগ মানুষের উপর আরও জোরে চেপে বসবে। নিরুপায় মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকবে। এই জনস্বার্থহীন রাজনীতির বিকল্প হিসাবেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) গণআন্দোলনের রাজনীতিকে সামনে নিয়ে এসেছে। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ স্পষ্ট দেখিয়েছেন, ভোটে জেতে দল, জনগণ জেতে গণআন্দোলনে। নীতিহীন রাজনীতিকে চিরতরে খতম করতে হলে ভোটসর্বস্ব রাজনীতি বর্জন করে গণআন্দোলনের রাজনীতিকেই শক্তিশালী করতে হবে।

জীবনাবসান

দার্জিলিং জেলায় এস ইউ সি আই (সি)-র ফাঁসিদেওয়া লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড ভোলা তিরকি ২৪ জুন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য, লোকাল সম্পাদক কমরেড শরৎ রায়, দেবাশীষ শর্মা, ধাইচু সিংহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন। মরদেহ পার্টি অফিসে আনা হয় এবং তাঁরা মাল্যদান করেন।

কমরেড ভোলা তিরকি যৌবনে অতি-বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন জেল খেটেছেন। কিন্তু ওই রাজনীতি তাঁকে দিশা দেখাতে পারেনি। জেলমুক্তির পরে এক গভীর হতাশা তাঁকে গ্রাস করে। এই অবস্থায় তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলের স্থানীয় নেতাদের মাধ্যমে মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে সংগঠনের কাজ শুরু করেন। প্রচণ্ড দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেও তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পার্টির কাজ করে গেছেন। পরিবারকেও সমর্থকে পরিণত করেছেন।

৬ জুলাই লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ফাঁসিদেওয়াতে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য।

কমরেড ভোলা তিরকি লাল সেলাম

নির্বাচন না প্রহসন

একের পাতার পর

বাক্সে সিল দিয়ে ভোট শেষ করা, ভোটকেন্দ্রে ভাঙচুর, ব্যালট বক্স নিয়ে পালানো এবং ভোটার ও ভোটকর্মীদের উপর হামলার যে সব ঘটনা রাজ্য জুড়ে ঘটেছে, এরপর এটাকে নির্বাচন কিংবা গণতন্ত্র কোনওটাই বলা যায় না।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, উত্তর ২৪ পরগণা, বীরভূম সহ প্রায় গোটা রাজ্যেই একই চিত্র। বহু ভোটকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনী বা সশস্ত্র পুলিশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। যেখানে তারা ছিল সেখানেও হয় নীরব দর্শক থেকেছে নতুবা বিরোধীদের উপর নৃশংস হামলা চালাতে সাহায্য করেছে। তার পরিণতিতেই এত মানুষের প্রাণহানি। কুলতলীতে এস ইউ সি আই (সি) -র ১১ জন কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এবং একজন কর্মী কাটারির আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীর এজেন্ট বোমায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। ওই জেলার হরিহরপাড়ার স্বরূপপুরে ৯টি বুথ দখল করে অবাধ ছাপ্পা দেয় তৃণমূল।

এই নির্বাচন ২০০৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক সিপিএমের তাণ্ডবকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এর বিরুদ্ধে আমরা জনসাধারণকে, বিশেষ করে ছাত্র-যুব সমাজকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

অস্ত্র ব্যবসার বড় খদ্দের বলেই মোদিজির এত খাতির আমেরিকায়

অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে সাড়ম্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি আমেরিকা ঘুরে এলেন। তাঁর এই সফর নিয়ে বিজেপির আইটি সেল সহ একচেটিয়া পুঁজির মালিকানাধীন মিডিয়া হাউস খুবই উচ্ছ্বসিত। তারা এমন একটা ভাব করছে যেন মোদিজি একটা অতুল কীর্তির অধিকারী হলেন এবং দেশের মানুষের এক মহা উপকার হল। যেন এর আগে আর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা সফর করেননি। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনও খুবই সমাদর দেখালেন মোদিকে। মোদি আবার সরকারি খরচে চল্লিশ লক্ষ টাকা দামের হীরের আংটি সহ অন্যান্য মূল্যবান উপহারও দিয়েছেন বাইডেন দম্পতিকে। একেবারে মহোৎসবের মতো আনন্দ উৎসব, খানাপিনা সেলফি তোলার সমারোহ চলল দুই দেশের শাসকদের মধ্যে।

আমেরিকার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাষ্ট্রপ্রধানদের যে বিশেষ ধরনের রাজকীয় ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হয়, সেইরকম ভোজসভায় মোদিকে আপ্যায়ন করলেন বাইডেন সাহেব এবং গোটা আমেরিকা জুড়ে সেই অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি পর্যন্ত সাড়ম্বরে প্রচার করা হল। কিন্তু কী এমন জরুরি প্রয়োজন ছিল ভারত সরকারের এই সফরের এবং আমেরিকান শাসকরাই বা ভারতীয় পুঁজিবাদের বর্তমান বিশ্বস্তম সেবাদাস নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে এত উচ্ছ্বসিত এবং গদগদ কেন?

চীনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতকে পাশে চায় আমেরিকা

স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বিকাশোন্মুখ ভারতীয় পুঁজিবাদ বৃহৎ ও পরিকাঠামোগত শিল্পগঠনের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গেই সুসম্পর্ক রেখে চলত। আবার আমেরিকা তখন দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত মিত্র ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্য সহায়তা করত। ভারতীয় পুঁজিবাদী শাসককুল আবার প্রয়োজনে আমেরিকা ও ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলোর থেকেও সহায়তা নিয়ে বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের ছোট অংশীদার হয়ে ওঠার উচ্চাশায় তাদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখত এবং ভারত যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে যোগ দেবে না, সেখানে পুঁজিবাদি রাষ্ট্রব্যবস্থাই বহাল থাকবে— সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়াকে এই আশ্বাস দেওয়ার জন্য সদ্য স্বাধীন অনান্য অনেক অ্যাফ্রো-এশীয় দেশের সঙ্গে নিজেদেরকে জোটনিরপেক্ষ বলে প্রচার করত। এর ফলে আবার একই সঙ্গে সদ্যস্বাধীন অন্যান্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতীয় পুঁজি প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল এবং ভারতীয় পুঁজিবাদ সেই সব দেশের বাজার দখল করতে শুরু করেছিল।

তবে ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের প্রত্যক্ষ সহায়তা দানে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ রুষ্ট হলে সোভিয়েত তার সামরিক শক্তি নিয়ে ভারতের পাশে দাঁড়ায়। এর পরে ক্রমশ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠা ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য ছোট রাষ্ট্রগুলোর ওপর প্রভাব বৃদ্ধি করে আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হতে শুরু করে। কিন্তু ১৯৯০ এর দশকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপে প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর থেকেই সোভিয়েত সহ গোটা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অর্থনীতি প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হলে ভারতীয় পুঁজিবাদী শাসকেরা একটু একটু করে আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা শুরু করে। ইতিমধ্যে সমাজতান্ত্রিক চীনেও প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হয়ে চীন কার্যত একটি মিলিটারি শাসিত সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয় এবং দক্ষিণ এশিয়া ও ইন্দো-প্যাসিফিক সমুদ্রে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদকে তীব্র প্রতিযোগিতায় ফেলে দেয়। কালক্রমে দক্ষিণ এশিয়ার প্রভুত্বের লড়াইয়ে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ ক্রমেই চীনের কাছে হটে যেতে থাকে। চীন আবার তার মূল ভূখণ্ডের কাছেই অবস্থিত এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রাচীনকাল থেকে চীনেরই অংশ বর্তমানে আমেরিকা নিয়ন্ত্রণাধীন তাইওয়ান দ্বীপরাষ্ট্রকে নিজের অধিকারে আনার জন্য ওই এলাকায় আমেরিকার সঙ্গে সামরিক পাঞ্জা কষা শুরু করে দেয় এবং দেখা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদী চীন সামরিক বলে কোনও অংশেই আমেরিকার থেকে কম নয়। অন্য দিকে, সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া আবার সমাজতান্ত্রিক যুগে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ইউক্রেন প্রভৃতি দেশগুলো দখল করার জন্য সেখানে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে এবং আমেরিকা বা অন্যান্য পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর চোখ রাঙানিকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করছে না। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে আমেরিকার যথেচ্ছ সেনা অভিযানের ফলও সে দেশের শাসকদের পক্ষে সুখকর নয়। এইসব দেশে মারাত্মক আহত প্রাক্তন সৈন্যরা এবং নিহতদের পরিবারবর্গ সহ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন আমেরিকান নাগরিকরা প্রশ্ন তুলছেন যে, সাত সমুদ্র পারের দেশের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আমেরিকান যুবকদের মরতে হবে কেন? তাঁরা বুঝেছেন যে, আসলে আমেরিকান পেট্রো ব্যারনদের স্বার্থেই এইসব যুদ্ধ। কাজেই, এখনই তাইওয়ান বা ইউক্রেনে সেনা পাঠানোও আমেরিকা বা ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ডাক্তারি ছাত্রদের উপর নতুন ফতোয়া ‘নেক্সট’

ছাত্র আন্দোলনের চাপে মন্ত্রীর সুর বদল

সাধারণ মানুষ অসুখে পড়লে আজও এমন ডাক্তার খোঁজেন যিনি ক্লিনিক্যাল সেন্স প্রয়োগ করে রোগ ধরতে পারেন এবং কম খরচে চিকিৎসা করতে পারেন। দুঃখের বিষয় হল, আজ আমাদের দেশের যারা ডাক্তারি শিক্ষার (এমবিবিএস) নিয়ম কানুন তৈরি করেন তারা আজ এই আশাকে দুরাশায় পরিণত করতে উদ্যত।

এই মোদি জমানায় আগেকার মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াকে তুলে দিয়ে তারা চালু করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত লোকেদের নিয়ে তৈরি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক একটি প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (এনএমসি)। এনএমসি বলেছে, মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটকে আগেকার এমবিবিএসদের মতো অত কিছু না জানলেও চলবে, তাদের হতে হবে ‘বেসিক ডক্টর’। তাই তারা এমবিবিএস সিলেবাস পরিবর্তন করেছে, যেখানে কমপিটেন্সি বেসড মেডিকেল এডুকেশন (সিবিএমই) এর নামে ছাত্রদের ক্লিনিক্যাল স্কিল গড়ে তোলার প্রক্রিয়া সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছে। এই একই সময়ে, মেডিকেল কলেজ চালু করার শর্তকে লঘু করে দিয়ে এনএমসি একদিকে পরিকাঠামোহীন জেলা হাসপাতালগুলিকে মেডিকেল কলেজের তকমা দিয়েছে। অন্যদিকে পরিকাঠামোহীন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ খুলে মালিকদের কোটি কোটি টাকা লাভ করার রাস্তা দরাজ হতে খুলে দিয়েছে। এই বিরাট পরিবর্তনগুলি কোনওটাই দেশের নামকরা ডাক্তার বা চিকিৎসক-শিক্ষকদের মতামত নিয়ে করা হয়নি। একতরফা ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র।

এক বছর ধরে এনএমসি-র এই সিদ্ধান্তগুলোর বিরুদ্ধে এআইডিএসও টানা প্রচার চালালেও

কলকাতা মেডিকেল কলেজে ‘নেক্সট’ বিরোধী বিক্ষোভ। ১ জুলাই

বেশিরভাগ মেডিকেল ছাত্রছাত্রীরা বিষয়টি তখনও বুঝতে পারেননি। এমবিবিএস শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সাড়ে চার বছরে ৯টি ইন্টার্নাল পরীক্ষা, ৪টি ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা এবং অসংখ্য ক্লাস টেস্ট দিতে হয়। অন্তিম বর্ষের এমবিবিএস ছাত্রদের মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি এবং পেডিয়াট্রিক মেডিসিন পড়তে হয় এবং সারা বছর ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির থিওরি এবং প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস হয়। এতদিন সন্ধেবেলা ওয়ার্ডে গিয়ে পেশেন্ট দেখে শেখারও দরকার হয়। সমস্ত পরীক্ষার পরে এক বছর ইন্টার্নশিপ করে তবে ডাক্তার হিসাবে স্বীকৃতি মেলে। এমডি, এমএস ইত্যাদি করতে চাইলে নিট-পিজি পরীক্ষা এবং বিদেশ থেকে পাশ করে এলে এফএমডিই পরীক্ষা দিতে হত এত দিন।

এনএমসি কর্তারা সম্প্রতি (২৭ জুন) দাওয়াই দিলেন, এই ফাইনাল এমবিবিএস পরীক্ষা, নিট-পিজি এবং এফএমজিই পরীক্ষা এই তিনটে পরীক্ষার জায়গায় তারা এখন একটি পরীক্ষা নেবেন। যার গালভরা নাম হল ন্যাশনাল এক্সিট টেস্ট অর্থাৎ নেক্সট। এখন এই একটি পরীক্ষা দিয়ে তারা তিনটে কাজ সারবেন। ফলে, এমবিবিএস কোর্সের অন্তিম বর্ষের ছাত্রদের এবার ফাইনাল এমবিবিএস পরীক্ষার বদলে বসতে হবে ন্যাশনাল এক্সিট টেস্ট (নেক্সট)-১ এ। এই পরীক্ষা পাস করলে ১ বছর ইন্টার্নশিপ শেষ করার পর আবার নেক্সট-২ পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই একজন মেডিকেল ছাত্র ডাক্তার হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন।

এখন যারা দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফাইনাল ইয়ারে পড়ছেন, তাদের আগামী ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে এই নেক্সট পরীক্ষাটিতে বসতে হবে। এনএমসি-র এই নতুন পরীক্ষায় ছাত্রদের পড়তে হবে চারটি বিষয়ের বদলে ১৯টি বিষয় এবং পরীক্ষা হবে মাল্টিপল চয়েজ কোয়েশ্চেন অনুযায়ী।

এই ঘোষণামাত্র একদিকে যেমন ছাত্ররা ক্ষোভে ফেটে পড়ছে, অন্য দিকে প্রাইভেট কোচিং সেন্টারগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেন তারা তৈরি হয়েই ছিল এর অপেক্ষায়। এই মুহূর্তে কোনও মেডিকেল কলেজের শিক্ষক জানেন না নেক্সট পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন কেমন হবে? ফলে হাওয়া উঠেছে পাস করতে হলে আর কলেজে এসে লাভ নেই। কিন্তু প্রাইভেট কোচিং সেন্টারগুলি বুক ফুলিয়ে বলছে আমাদের কাছে নেক্সট পরীক্ষা পাশের চাবিকাঠি আছে। ফলে হাজার হাজার টাকা দিয়ে দলে দলে মেডিকেল ছাত্রছাত্রী অনলাইন কোচিং এর দ্বারস্থ হতে বাধ্য হচ্ছে। কলেজের ক্লাসরুম এবং ক্লিনিক্যাল ক্লাসগুলি খাঁ খাঁ করছে।

তাহলে কি কোচিং সেন্টারগুলির সঙ্গে যোগসাজসে এই পরীক্ষা চাপিয়ে দেওয়া হল? প্রশ্ন উঠেছে, একই পরীক্ষা কেমন করে পাশ করার এবং র‍্যাঙ্ক করার জন্য হতে পারে? দুটির প্রশ্নের ধরন তো আলাদা হওয়ার কথা। এমনিতেই ডাক্তারি ছাত্রদের মধ্যে মানসিক অবসাদ এবং তার পরিণতিতে আত্মহত্যা ক্রমবর্ধমান। তার মধ্যে এমন চাপ তৈরি করে ছাত্রদের উপর মানসিক চাপ আরও বাড়ানো হল না?

কোচিং-এ এমসিকিউ মুখস্ত করে ডাক্তারি ছাত্ররা হয়তো পরীক্ষা বৈতরণী উৎরে যাবেন,

ছয়ের পাতায় দেখুন

৫ আগস্টের ব্রিগেড হবে
মেহনতি জনতার মিলনক্ষেত্র

উত্তর কলকাতার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষের প্রচার চলছে। দলের কর্মীরা ব্রিগেডে আসার আবেদন জানিয়ে হ্যান্ডবিল দিতেই এক প্রৌঢ় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, বাবা সিপিআই করতেন। বাড়িতে বামপন্থী একটা পরিবেশ ছিল। ছোট থেকেই এই পরিবেশে বড় হয়েছি। এস ইউ সি সম্পর্কে দলের নেতারা বলতেন, এস ইউ সি কংগ্রেসের দালাল। আজ কী হচ্ছে? সিপিএম সেই কংগ্রেসকেই গলার মালা করেছে। এখন তৃণমূলকে দেখছি। এরা কেউ সাধারণ মানুষের কথা ভাবে না। ক্ষমতার গদিতে বসাই এদের একমাত্র লক্ষ্য। এখন মনে হচ্ছে আপনারাই ঠিক। এতদিন আপনাদের চিনতে পারিনি, তার খেসারত দিতে হচ্ছে। খেসারত কিসের? জানতে চাওয়ায় পঞ্চাশোর্ধ্ব ওই মানুষটির আক্ষেপ, খেসারত নয়! পাশে থেকে আপনাদের শক্তি অনেক বাড়ানো দরকার ছিল। আপনারাই তো সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে লড়াই করেন। অন্যরা তো মেকি দরদি। শিক্ষা বলুন, বিদ্যুৎ বলুন, জিনিসপত্রের দামের বিরুদ্ধে বলুন, একটাই তো প্রতিবাদী কণ্ঠ। আমি অবশ্যই ব্রিগেড যাব।

স্বনামখ্যাত এক চিকিৎসক বললেন, অন্য চিকিৎসকদের নিয়ে ব্রিগেড যাব। দর্শন জগতে শিবদাস ঘোষের অবদান, চিকিৎসায় নৈতিকতা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে শিবদাস ঘোষের চিন্তা যুগান্তকারী। কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ শুনতে ৫ আগস্ট আত্মীয়-বন্ধুদেরও নিয়ে আসার কথা বললেন তিনি।

মধ্য কলকাতার রাজা রামমোহন সরণিতে ৫ আগস্টের ব্রিগেড সমাবেশের প্রচার চলছে। বয়স্ক এক মহিলা তিনতলা থেকে নেমে প্রচারপত্র নিলেন। মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের শতবর্ষ শুনে সোভিয়েত বিপ্লবের রূপকার লেনিনের কর্মকাণ্ড আবেগে বলতে শুরু করেন। বললেন, এঁরাই তো দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এঁদের শতবর্ষ হবে না তো কাদের হবে! ব্রিগেড সমাবেশের জন্য সাধ্যমতো সাহায্য স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে দিলেন। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখায় বয়স যে বাধা হতে পারে না, তা তাঁর চোখমুখে ফুটে উঠল।

সূর্য সেন স্ট্রিট লাগোয়া এলাকায় প্রচার চলছে। এক মহিলা উচ্চকণ্ঠে বললেন, ব্রিগেড যেতে হবে নাকি? পাশ থেকে একজন বললেন, ও সে তো প্রায়ই হয়। ওই মহিলা বললেন, না, এটা এসইউসিআই-এর ব্রিগেড। এরা আমাদের কাছে হাত পেতে পয়সা তুলে মিটিং করছে। আমাদের যেতে বলছে। তারপর এক স্বেচ্ছাসেবককে বললেন, আমাদের অভাবের সংসার। কিন্তু অল্প বয়স থেকেই দেখেছি আমার মা আপনাদের সভা-সমাবেশের জন্য কত কষ্ট করে রুটি করে দিত। তাই দেখে দেখে আমরা এই পার্টিটাকে চিনেছি। এরা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের থেকে সাহায্য নিয়ে তাদের দাবিতেই লড়ে, মিছিল করে। আমরা যাব না, তো কে যাবে!

বেলেঘাটা এলাকায় পরিচারিকার কাজ করেন এক মহিলা। কাজের বাড়িগুলিতে বলে রেখেছেন, ৫ আগস্টের জন্য তাঁকে ছুটি দিতে এবং সভার জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করতে। বললেন, ৩৬৫ দিন ২৪ ঘণ্টা তো খেটেই যাই, ঘরে কি বাইরে। কিন্তু ওই একটা দিন নিশ্চয় যাব। পড়াশোনা না জানা সমাজের প্রত্যন্ত অংশের একজনও শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ।

সমাজের সব অংশের মানুষের অংশগ্রহণে ৫ আগস্ট ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড হয়ে উঠবে যথার্থই মেহনতি মানুষের সংগ্রামের দিশা জাগানো এক মিলনক্ষেত্র, যা বাঁচতে শেখায়, বেঁচে থাকার পথ দেখায়।

ফ্রান্স ঃ গণবিক্ষোভের শিকড় অনেক গভীরে

পেনশন সংস্কার নিয়ে দেশজোড়া তুমুল আন্দোলনের রেশ মেলাতে না মেলাতেই এক অশ্বেতাঙ্গ কিশোরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আবার উত্তাল ফ্রান্স। শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি হাজারো দমন-পীড়ন চালিয়েও খেটে-খাওয়া মানুষের বুকে জ্বলতে থাকা ক্ষোভের আগুন যে কোনও মতেই নেভাতে পারছে না, এই বিক্ষোভ তা দেখিয়ে দিয়ে গেল।

প্যারিসের শহরতলি ন্যান্তেরে ২৭ জুন পুলিশ খুব কাছ থেকে গুলি করে খুন করে নাহেল এম নামে আলজেরীয় বংশোদ্ভূত ১৭ বছরের এক কিশোরকে। অজুহাত দেয়, নাহেল তাদের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এক পথচারীর ছড়িয়ে দেওয়া ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেলে পুলিশের মিথ্যাচার ধরা পড়ে যায়। প্রচণ্ড ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে ফ্রান্সের মানুষ। গোটা দেশের শহর নগর ভেসে যায় বিক্ষোভের ঢেউয়ে। ক্রোধে উন্মত্ত বিক্ষোভকারীরা নানা সরকারি দফতর, টাউন হল, স্কুল সহ গাড়িতে আগুন লাগায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পথে নামানো হয় ৫০ হাজার পুলিশ। হাজার হাজার বিক্ষোভকারীকে তারা গ্রেফতার করে। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছয় প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁকে বিদেশে বৈঠক বাতিল করে তড়িঘড়ি ফ্রান্সে ফিরে আসতে হয়।

কেন ফ্রান্সে আবার এই সর্বব্যাপক বিক্ষোভ? প্রেসিডেন্ট মাকরঁ বলেছেন, এ প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যার অতীত। কিন্তু সেটা যে সত্য নয়, নাহেলের মায়ের মন্তব্যে তা স্পষ্ট। সদ্যকিশোর পুত্রের মৃত্যুতে শোকার্ত মা বলেছেন, 'পুলিশ দেখল একটা অশ্বেতাঙ্গ (আরবি) বাচ্চা ছেলে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে খুন করতে ইচ্ছা হল তাদের'।

নাহেলের মৃত্যুতে এত বড় বিক্ষোভের শিকড় আসলে রয়েছে অনেক গভীরে— বুর্জোয়া বিপ্লবের ফ্রান্স, 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র স্লোগানে এক সময়ে সোচ্চার ফ্রান্সের সমাজ-মানসিকতার পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা বর্ণবিদ্বেষের মধ্যে।

ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্সেই রয়েছে সবচেয়ে বেশি জাতি-উপজাতিগত বৈচিত্র্য। ২০২২-এর একটি সরকারি সমীক্ষা দেখাচ্ছে, সে দেশের ৬০ বছরের কম বয়সী অধিবাসীদের অন্তত ৩২ শতাংশের পূর্বপুরুষ বাইরে থেকে এসেছেন। আর ১৮ বছরের কম বয়সী মানুষের ৮৩ শতাংশেরই হয় বাবা নয়ত মা ছিলেন উত্তর আফ্রিকা, আলজেরিয়া কিংবা আফ্রিকার কোনও না কোনও দেশের অধিবাসী। নামে প্রজাতান্ত্রিক হলেও এবং আইনের খাতায় নাগরিকদের মধ্যে কোনও বৈষম্য না থাকলেও কার্যত ফ্রান্সের সমাজ জুড়ে ভাল মতোই রয়ে গেছে অশ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষ। নাহেলের মৃত্যুতে এই জনবিক্ষোভের পিছনে সেই বিদ্বেষের বিরুদ্ধে গরিব খেটে-খাওয়া মানুষের ক্ষোভ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিশ্বের বহু জায়গাতেই, বিশেষ করে আফ্রিকার দেশে দেশে ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। সেখানকার প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ লুট করে সমৃদ্ধ হয়েছে ফ্রান্স। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধীরে ধীরে সেইসব দেশ ঔপনিবেশিক শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু আজও আফ্রিকার নানা দেশে ফ্রান্সের সামরিক উপস্থিতি রয়েছে। ফ্রান্সের একচেটিয়া পুঁজি আজও নানা কৌশলে পূর্বতন উপনিবেশগুলির সম্পদ পরোক্ষ ভাবে লুট করে নিজেদের মুনাফার ভাণ্ডার ভরিয়ে চলেছে। সেই উপনিবেশের দিনগুলি থেকেই ফ্রান্সে নানা কারণে বসতি তৈরি করেছে অন্য দেশের মানুষ। তাদের শ্রমে সমৃদ্ধ হয়েছে ফ্রান্স। আজও একটু বেশি মজুরি, আরও একটু সুযোগসুবিধার আশায় বিভিন্ন দেশ থেকে, বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলি থেকে অশ্বেতাঙ্গ গরিব মানুষ ফ্রান্সে পাড়ি জমায়। কম মজুরিতে তাদের দিয়ে কাজ করানো যায় বলে ফ্রান্সও আশ্রয় দেয় তাদের। ফলে সেখানকার নাগরিকদের একটি বড় অংশ অধিকার করে রেখেছে কালো মানুষরা। এই কালো মানুষগুলি সাধারণত বাস করেন ফ্রান্সের শহরতলি অঞ্চলে। এঁদের অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় আর্থিক ভাবে পিছিয়ে-পড়া। দেশের দরিদ্রতম নাগরিক হলেন এই অভিবাসী মানুষরা। পড়াশোনার দিক দিয়েও শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় এঁরা পিছিয়ে। বেকারত্বও এঁদের মধ্যে তুলনায় অনেক বেশি।

ফ্রান্সের শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের একটি বড় অংশের ভিতরে থেকে যাওয়া অশ্বেতাঙ্গদের 'অপর' ভাবার মানসিকতার ফলে খাতায়-কলমে যতই সমতার কথা বলা থাক, পুলিস-প্রশাসনের সন্দেহ, নজরদারি ও রোষের মুখে সবচেয়ে বেশি পড়তে হয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকা এইসব অশ্বেতাঙ্গ মানুষদেরই। ২০১৭ সালে ফ্রান্স সরকার একটি আইন পাশ করেছে। সেখানে ট্রাফিক আইন না মানলে পুলিশকে গুলি চালানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০১৭ থেকে এই আইনের বলি হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশই অশ্বেতাঙ্গ, আফ্রিকা বা আরব বংশোদ্ভূত মানুষ।

পুঁজিবাদী ফ্রান্সের শাসক শ্রেণি, তাদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার ও সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের শোষণের স্বার্থেই সমাজ থেকে এই অশ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষ দূর করার কোনও চেষ্টা করে না। শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিজস্ব নিয়মে দেশে অনিবার্য ভাবে বেকারি, দারিদ্রের মতো মূল সমস্যাগুলির কারণ হিসাবে তারা অভিযোগের কৌশলী আঙুল তোলে অশ্বেতাঙ্গদের দিকে। এই অশ্বেতাঙ্গরাও যে ঘাম ঝরিয়ে পরিশ্রম করে দেশের সম্পদ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন, সে সব চাপা দিয়ে সমাজ-মননে বর্ণবিদ্বেষের বিষ ফেনিয়ে তোলে শাসকরা। ঠিক যেমন করে ভারতের সাম্প্রদায়িক স্বৈরাচারী শাসক সমস্ত সমস্যার মূল

কারণ হিসেবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দিকে আঙুল তোলে।

এইভাবে দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গ সমাজের চোখে নিম্ন শ্রেণির মানুষ হিসেবে গণ্য হওয়ার যে যন্ত্রণা বছরের পর বছর সহ্য করে আসছেন ফ্রান্সের অশ্বেতাঙ্গ মানুষ, নাহেলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তাদের সেই জমে থাকা ক্ষোভ আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুঁজিবাদী শোষণের কবলে পড়ে সাধারণ মানুষের ক্রমাগত দুর্বিষহ হয়ে ওঠা জীবন। এর বিরুদ্ধে ইয়েলো ভেস্ট আন্দোলন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক পেনশন সংস্কার বিরোধী আন্দোলনে বারবার উত্তাল হয়েছে দেশ। গণদাবীর পাতায় আমরা বহু বার দেখিয়েছি, এই বিক্ষোভগুলির পিছনে আসলে রয়েছে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে জমে ওঠা ক্রোধ। গরিবি, বেকারি, শিক্ষাহীনতা, চিকিৎসা না পাওয়ার ক্ষোভের বারুদে আগুন দেয় কোনও না কোনও ঘটনা। ক্ষোভের সেই আগুন এখনও ধিকিধিকি জ্বলছে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে ফ্রান্সের গরিব অশ্বেতাঙ্গ বঞ্চিত মানুষের বুকে। নাহেলের মৃত্যুতে সেই ক্ষোভেরই উদগীরণ হল আরও একবার।

কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য, ফ্রান্সের মানুষ বারবার সরকার বিরোধী বিক্ষোভে ফেটে পড়লেও সঠিক নেতৃত্বের অভাবে তাদের আন্দোলনগুলি যথার্থ পরিণতিতে পৌঁছতে পারেনি, পারছে না। কিছু দিন চলার পর স্বাভাবিক নিয়মে বিক্ষোভ স্তিমিত হয়ে এলে শাসকরা আগামী দিনে আন্দোলন দমন করার লক্ষ্যে আরও কঠোর আইন তৈরি করে। পুলিশ-মিলিটারির হাতে তুলে দেয় অত্যাচারের আরও অবাধ ক্ষমতা। ঠিক যেমন নাহেলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জ্বলে ওঠা বিক্ষোভের আগুন একটু নিভে আসতেই, সন্দেহভাজনদের উপর পুলিশ যাতে অবাধে নজরদারি চালাতে পারে, ইতিমধ্যেই ফ্রান্স সরকার সেই সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন করে ফেলেছে। ফলে আজ শুধু ফ্রান্স নয়, শ্রেণিবিভক্ত সমস্ত দেশেরই খেটে-খাওয়া বঞ্চিত-অত্যাচারিত মানুষের প্রয়োজন একটি সঠিক মার্ক্সবাদী দল, যার নেতৃত্বে শাসকের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথে ধরে ধীরে ধীরে শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকেই উচ্ছেদের লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে।

শিবদাস ঘোষ জন্মশতবার্ষিকীতে সভা

কর্ণাটক ঃ সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কর্ণাটকের বাঙ্গালোর শহরের গুন্ডুরাও হলে ৮ জুলাই আলোচনা সভা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ (ইনসেট)। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কে উমা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আসানসোল ঃ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ব্যাপক চর্চা আজ জরুরি প্রয়োজন। দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সর্বাত্মক সঙ্কট তা থেকে মুক্ত করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে চাই শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী মতবাদ। ২ জুলাই আসানসোলে জেলা গ্রন্থাগার হলে এক সমাবেশে এ কথা বলেন এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুব্রত গৌড়ী। শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে এক কর্মীসভার আয়োজন করেছিল দলের আসানসোল লোকাল কমিটি ও কুলটি ইউনিট। সভায় এ ছাড়া

বক্তব্য রাখেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বাবলা ভট্টাচার্য।

রাঁচিতে ছাত্র আন্দোলনের জয়

যোগদা সৎসঙ্গ মহাবিদ্যালয়ে রেজাল্টের ব্যাপক অসঙ্গতি নিয়ে ১৭ জুন থেকে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে লাগাতার আন্দোলন গড়ে ওঠে। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাঁচি জেলা সভাপতি শ্যামল মার্ডি, সম্পাদক খুশবু কুমারী এবং অফিস সম্পাদক জুলিয়াস ফুচিক প্রমুখ।

১৯ জুন অধ্যক্ষের অঙ্গুলিহেলনে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর ঝাড়খণ্ড সরকারের পুলিশ লাঠি চালায় এবং তাঁদের জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করে জেলে আটকে রাখে। কিন্তু আন্দোলনকে দমাতে পারেনি।

এআইডিএসও ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ২০ জুন স্থানীয় অ্যালবার্ট চকে এর তীব্র নিন্দা করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ২১ জুন জামশেদপুর, ঘাটশিলা, চাইবাসা, সরাইকেলা, আদিত্যপুর সহ নানা জায়গায় রাজ্যস্তরীয় প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। লাগাতার আন্দোলনের ফলে রেজাল্টের অসঙ্গতি দূর করতে বাধ্য হন কর্তৃপক্ষ। যে সমস্ত ছাত্র রেজাল্ট পুর্নমূল্যায়নের জন্য আবেদন করেছিলেন তারা সকলেই পাশ করে যান। ছাত্র আন্দোলনের এই জয়ে ছাত্ররা খুবই উল্লসিত। ছাত্রনেতাদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে ছাত্ররা।

মহান নেতার শিক্ষা থেকে

"এ কথা এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, সমাজের বর্তমান কাঠামোটা আজকের শাসকশ্রেণি বুর্জোয়াদেরই সৃষ্টি। বুর্জোয়াশ্রেণির যে বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতি, যা মার্কসের সময় থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি বলে পরিচিত, তা সামন্তী ব্যবস্থার সাথে অর্থাৎ সামন্তী ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তিবিশেষ, একটা সমগ্র সামাজিক সম্প্রদায় ও স্থানীয় সংস্থা যেসব বিশেষ সুবিধা পেয়ে এসেছে, তার সাথে এবং বংশগত সম্পর্কের অধীনস্ত যে সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো, তার সাথে (সেই পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি) খাপ খাচ্ছিল না। বুর্জোয়াশ্রেণি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙেছে এবং তার ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে তুলেছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা— যে সমাজব্যবস্থা হচ্ছে অবাধ প্রতিযোগিতার রাজত্ব, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আইনের চোখে সমানাধিকারের রাজত্ব, সমস্ত পণ্যমালিক ও পুঁজিবাদের আশীর্বাদপুষ্ট বাকি সকলের রাজত্ব। এরপর থেকেই পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে পারল।

বাষ্প, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্র তৈরির যন্ত্র যখন থেকে পুরনো ধরনের কারখানাকে আধুনিক শিল্পে রূপান্তরিত করে দিল, তখন থেকে বুর্জোয়াশ্রেণির পরিচালনায় উৎপাদন শক্তি এমন দ্রুততায় ও এমন মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে, যার কথা আগে কেউ কখনও শোনেনি। কিন্তু, পুঁজিবাদের বিকাশের সময় যেমন তার প্রভাবে পুরনো ধরনের উৎপাদন ও হস্তশিল্প আরও বিকশিত হয়ে গিল্ডের সামন্তী শৃঙ্খলের সঙ্গে সংঘাতে এসেছিল, ঠিক তেমনি আজকের আধুনিক শিল্পও তার আরও পরিপূর্ণ বিকাশের পর্যায়ে, সংঘাতে আসছে সেইসব সীমার সঙ্গে, যে সীমার মধ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি তাকে আবদ্ধ করে রেখেছে।

নয়া উৎপাদিকা শক্তি ইতিমধ্যেই উৎপাদন শক্তিকে ব্যবহার করার পুঁজিবাদী পদ্ধতিকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এবং উৎপাদিকা শক্তির সাথে উৎপাদন পদ্ধতির এই যে বিরোধ তা মানুষের মনের কল্পনায় সৃষ্ট আদিম পাপ ও স্বর্গীয় ন্যায়ের মধ্যে বিরোধের মতো কোনও বিরোধ নয়। আমাদের জানার বাইরে, এমনকি যারা এই সংঘাত সৃষ্টি করেছে, সেই সব মানুষদের অভিপ্রায় ও কর্ম নিরপেক্ষভাবেই, বাস্তব সত্য ঘটনা হিসাবে এই সংঘাত অবস্থান করছে। আধুনিক সমাজতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে চিন্তার ক্ষেত্রে এই বাস্তব সংঘাতেরই প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। যে শ্রেণি এই সংঘাতে পীড়িত হচ্ছে, সর্বাগ্রে সেই শ্রমিক শ্রেণির মননজগতে এই সংঘাতের আদর্শ প্রতিফলন হচ্ছে সমাজতন্ত্র।"

সমাজতন্ত্র ঃ কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক
ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

ভোটলুঠ প্রতিরোধ গ্রামবাসীদের

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর ব্লকের লোকপুর গ্রাম। ভাগীরথী নদীর তীরে খুব ছোট্ট এই গ্রামে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একসাথে বাস করে। কী ধর্মীয়, কী রাজনৈতিক, কখনও কোনও বড় উত্তেজনার মুখোমুখি হতে হয়নি তাদের। তা নিয়ে গ্রামবাসীদের গর্ব রয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের দিন যে ঝঞ্ঝাটের পরিস্থিতি তৈরির জন্য শাসক দল টিএমসি চেষ্টা করেছিল, তাকে সম্মিলিত ভাবে রুখে দিলেন গ্রামের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা।

ওই গ্রামসভার আসনে ভোটে লড়েছে এস ইউ সি আই (সি) সহ ৬ জন প্রার্থী। এস ইউ সি আই (সি) যথেষ্ট সম্মানজনক পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীর একটা বড় অংশের সমর্থন পায়। শাসক দলের প্রার্থী ও তার এজেন্ট ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে সাধারণ মানুষ রুখে দেন। ভোট চলাকালীন খবর আসে লোকপুরের পাশের গ্রাম ও তার পাশের গ্রামে ভোট লুঠ করতে নেমেছে টিএমসি-র গুন্ডারা। যথেচ্ছ রিগিং, ছাপ্পা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। এদিকে লোকপুর গ্রামের নেতারা ওই গুন্ডাবাহিনীকে গ্রামে আসার জন্য ফোন করে আহ্বান জানাতে থাকে। বিষয়টি জানাজানি হতেই সার্বিকভাবে প্রতিরোধ করতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ সহ বিরোধী দলের কর্মীদের কাছে আবেদন জানান এস ইউ সি আই (সি)-র সংগঠকরা। গ্রামের একটা বড় অংশ একত্রিত হয়ে বুথের সামনেই ঘোষণা করে গ্রামের বাইরে থেকে কোনও গুন্ডাবাহিনীকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, শান্তি বিঘ্নিত করা যাবে না। ঘোষণা করা হয় যে যদি কোনও গুন্ডাবাহিনী গ্রামে প্রবেশ করে, তা হলে তাদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। এই নাগরিক প্রতিরোধ দেখে শাসকদল আশ্রিত গুন্ডাবাহিনী গ্রামে ঢোকার সাহস দেখাতে পারেনি। এই জয় হয় গ্রামবাসীদের শুভবুদ্ধি এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উপযুক্ত ভূমিকার জন্য।

ভোটে কে জিতবে তা সময় বলবে। কারণ শাসক দলের টাকা, মদ, মাংস, বিরিয়ানি বিলিয়ে দেওয়া আর নানা প্রকারে গরিব মানুষকে ভয় দেখানো, এসব ফ্যাক্টর ছিলই। কিন্তু গ্রামের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যেভাবে ভূমিকা নিয়েছেন এবং এস ইউ সি আই (সি)-র সঠিক সাজেশনগুলো খোলামনে গ্রহণ করেছে তার জন্য সকলেরই অভিনন্দন প্রাপ্য।

সমাজমাধ্যমে নিজের গ্রামের অভিজ্ঞতাটি লিখেছেন চিকিৎসক কবিউল হক

অস্ত্র ব্যবসার বড় খদ্দের

তিনের পাতার পর

এই কারণে, বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের সঙ্গে পাঞ্জা কষায় দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আজ একান্ত প্রয়োজন।

সমর শিল্পে ভারত চায় আমেরিকার সহযোগিতা

দ্বিতীয়ত, বিশ্বপুঁজিবাদের বর্তমান ভয়াবহ বাজার সংকটের ফলে ভারত আমেরিকা দুই বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশই আজ বাজার সংকটে জেরবার। আজকের ভারতে ১৪২ কোটি লোকের মধ্যে ৭০ শতাংশেরই কোনও ক্রয়ক্ষমতাই নেই অর্থাৎ আধুনিক বাজারে সাজানো হরেকরকম পণ্য কেনার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা শুধু কোনও রকমে একবেলা আধপেটা খাবার জোগাড় করতে পারে বা কখনও তাও পারে না। এমন অবস্থায় ভোগ্যপণ্যের শিল্প ভারতীয় পুঁজিবাদ আর নতুন করে তৈরি করতে চায় না, বরং চালু শিল্পই বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। কিন্তু আদানি, আম্বানি, টাটা প্রভৃতি ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলি আবার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনীদের তালিকায় নিজেদের নাম তুলে নিতে পেরেছে। তাদের কেনা গোলাম বিজেপি সরকারের দ্বারা একটার পর একটা সুবিশাল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ জলের দরে সম্পূর্ণ বা আংশিক কিনে নিয়ে, সরকারকে দিয়ে নিজেদের হাজার হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স মকুব করিয়ে নিয়ে, আকাশচুম্বী লাভে পেট্রোপণ্যের ব্যবসা করে তারা গোটা দেশের ৯০ শতাংশ সম্পদেরই মালিকে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই বিপুল পুঁজি এখন তারা খাটাবে কোথায়? নরেন্দ্র মোদি তাই নতুন আওয়াজ দিয়েছেন 'মেক ইন ইন্ডিয়া'। মজার ব্যাপার, বিশ্বরাজনীতিতে ভারতীয় ও চীনা সাম্রাজ্যবাদ পরস্পরের ঘোর শত্রু হলেও বাণিজ্যিক আদান প্রদানে দু'দেশের পুঁজিপতিদের ভালই বোঝাপড়া রয়েছে। সস্তা চীনা পণ্যে ভারতের ভোগ্যপণ্যের বাজার বর্তমানে ভেসে যাচ্ছে। যাবতীয় ইলেকট্রনিক্স থেকে শুরু করে বাঙালির বিয়ের কার্ড, নকল বেনারসী শাড়ি পর্যন্ত চীনে তৈরি হয়ে এ দেশে বিক্রি হচ্ছে। উৎপাদন শিল্পের ঝঞ্ঝাট এড়ানোর জন্য ভারতীয় পুঁজিপতিরাও এগুলো নিজেরা তৈরি না করে আমদানি করে বিক্রি করেই লাভ করছে। তাই মোদিজির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' আসলে হল, দেশে অস্ত্র কারখানা গড়ে তোলা। সংকটগ্রস্ত অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মতোই ভারতীয় শাসকশ্রেণিও অর্থনীতির সামরিকীকরণ শুরু করেছে বহুদিন আগেই। তবে এতদিন তারা শুধু চীন পাকিস্তানের জুজু দেখিয়ে বিদেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র ও যুদ্ধ সম্ভার কিনছিল। এখন ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা পাশ্চাত্য ধনকুবেরদের তুলনীয় পর্বতপ্রমাণ পুঁজির অধিকারী হয়ে নিজেদের দেশেই অস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সম্ভার তৈরি করতে চাইছে। কিন্তু এর জন্য চাই অস্ত্র নির্মাণশিল্পে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ আমেরিকান শিল্পপতিদের সাহায্য। আমেরিকান পুঁজিও ভারতের ১৪২ কোটি জনসংখ্যার বিরাট বাজার পেতে মরিয়া।

কী চুক্তি স্বাক্ষরিত হল

মোদিজির এবারকার সফরে তাই বাইডেন সরকারের মধ্যে অস্ত্র ও সামরিক সম্ভার নির্মাণ ও বিক্রয়ের নিম্নলিখিত চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হয়েছেঃ ১. তেজস এমকে টু লাইট কমব্যাট যুদ্ধবিমান আমেরিকার জেনেরাল ইলেকট্রিক ও ভারতের হিন্দুস্তান এরোনটিক লিমিটেড যৌথ উদ্যোগে তৈরি করবে। ২. আমেরিকা ভারতকে তিন বিলিয়ন ডলার মূল্যে তিরিশটি এমকিউ-নাইন-বি মডেল প্রিডেটর ড্রোন বিক্রি করবে। ৩. আমেরিকার সেমিকনডাক্টর এবং চিপ নির্মাতা মাইক্রন টেকনোলজি কোম্পানি গুজরাটে চিপ নির্মাণ শিল্প গড়ে তোলার জন্য ৮২৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে এবং গুজরাট রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পে ২.৭৫ বিলিয়ন ডলার ঢালবে। প্রসঙ্গত, এই সেমি কনডাকটর ও চিপ নির্মাণ শিল্পে মার্কিন পুঁজির সিংহভাগ খাটে তাইওয়ানের সেমিকনডকটর শিল্পে এবং তাইওয়ানেই সারা বিশ্বের ৮০ শতাংশ চিপ ও সেমিকনডাক্টর তৈরি হয়। স্পষ্টতই তাইওয়ানের অধিকার নিয়ে চীনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধায় আমেরিকা এখন তার নতুন বন্ধু রাষ্ট্র ভারতে এই শিল্প সরিয়ে আনতে চাইছে।

ভারত সহ গোটা বিশ্বে বেকারি আজ সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। সরকারি হিসেব অনুযায়ীই ভারতে কর্মক্ষম যুবকদের ২৫ শতাংশই বেকার। যাঁরা বা কাজ করেন তাঁদের সিংহভাগের আয় নামমাত্র। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মোদি বাইডেন সাম্রাজ্যবাদী চক্র ভারতের সস্তা শ্রমশক্তিকে লুঠ করারও ফন্দি এঁটেছে। আমেরিকান ধনকুবের স্যাম অল্টম্যান, ভারতের আনন্দ মহীন্দ্রা, মুকেশ আম্বানি প্রমুখ শিল্পপতিরা একযোগে বসে 'ইনোভেশন হ্যান্ডশেক' নামে একটি নতুন নীতি তৈরি করেছে। শিল্পায়নের ও কর্মসংস্থানের ধুয়ো তুলে এইসব শিল্পে এতদিনের শিল্প ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনও শ্রমনীতিই আর থাকবে না। সরকারি ব্ল্যাঙ্ক চেক নিয়ে তারা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করবে এবং 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার' পলিসির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করবে।

জনগণের মধ্যে মোদিবিরোধী ঝড়

স্পষ্টতই, যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্ব রাজনীতিতে নিজ নিজ বাজার দখল ও সম্প্রসারণ এবং অস্ত্র নির্মাণ ও কেনাবেচার মাধ্যমে নিজ নিজ অর্থনীতিতে কৃত্রিম তেজিভাব সৃষ্টি করা এবং একই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে ভুয়ো যুদ্ধাতঙ্ক তৈরি করে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে ধামাচাপা দিয়ে রাখাই মোদির এই আমেরিকা সফরের উদ্দেশ্য। ভারত বা আমেরিকার জনসাধারণের মৌলিক সমস্যা সমাধানের কোনও কথা এখানে আলোচিত হয়নি এবং উদ্দেশ্যও তা ছিল না। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মোদির এই সফর নিয়ে আমেরিকার গণতন্ত্রপ্রিয় এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে। ২০০২ সালে মোদিরই মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়ে গুজরাতের ভয়াবহ দাঙ্গা ও মুসলিমদের গণহত্যা, মুসলিম রমণীদের গণধর্ষণ সব কিছুই যে মোদি সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে হয়েছিল এবং এর ফলে ২০১৪-তে মোদি ভারতের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন আমেরিকান সিনেট আমেরিকায় মোদির প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল— এ কথা গণতন্ত্রপ্রিয় আমেরিকান জনসাধারণ ভোলেননি। 'ওহে বাইডেন, মোদিকে জিজ্ঞেস করো' লেখা ব্যানার নিয়ে সারা দেশে সর্বত্র মোদি-বাইডেন মিত্রতা বিরোধী অসংখ্য বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। অর্থাৎ বিক্ষোভকারীরা প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে বলছেন, 'মোদিকে প্রশ্ন করো'— তাঁর সরকার গুজরাত দাঙ্গা দমন করার চেষ্টা না করে সহায়তা করেছিল কেন? কেন তাঁর দল দেশে মুসলিম বিরোধী উগ্র হিন্দুত্ববাদী নীতি নিয়ে চলে? কেন মুসলিমদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে? কেন প্রতিনিয়ত ভারতে দলিতদের ওপর অত্যাচার চলছে? কেন সরকারের সমালোচনাকারী সাংবাদিক ও সমাজকর্মীদের মিথ্যা অভিযোগে জেলে পোরা হচ্ছে, এমনকি হত্যা করা হচ্ছে? মণিপুরে জাতিদাঙ্গা দমন করতে মোদি সরকার ব্যর্থ কেন? গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে তৈরি বিবিসি-র তথ্যচিত্র মোদি সরকার ভারতে নিষিদ্ধ করল কেন? উল্লেখ্য অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং হিউম্যান রাইটস সংগঠন মোদির আমেরিকা সফরকালে এই তথ্যচিত্র প্রকাশ্যে দেখানোর ব্যবস্থা করেছিল। বিক্ষোভকারীদের মতে মোদিকে এত খাতিরদারি করার পরিবর্তে 'মুক্ত দুনিয়া'র দেশের প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এইসব প্রশ্ন তোলা উচিত। শুধু গণবিক্ষোভই নয়, আমেরিকান সিনেটের সত্তর জনেরও বেশি আইনপ্রনয়নকারী সদস্য যৌথভাবে বাইডেনকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দাবি করেছে যে, তিনি যেন ভারতে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনতার বিষয়ে মোদির সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁরা লিখেছেন যে, ভারতে বর্তমানে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং সমাজকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর সরকারি আক্রমণ এবং সংবাদমাধ্যম ও ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। আমেরিকান কংগ্রেস ও সিনেট সদস্যদের একটা বড় অংশ মোদির বক্তৃতা বয়কট করেছেন এবং আমেরিকান কংগ্রেসে মোদির মতো একজন সাম্প্রদায়িক নেতাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বাইডেন প্রশাসনের সমালোচনাও করেছেন। সব মিলিয়ে মোদির এবারকার আমেরিকা সফরে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সেবাদাস শাসকেরা যেমন বিশ্বজুড়ে তাদের শোষণের শৃঙ্খলকে আরও মজবুত করতে পরস্পর আরও নিবিড় বোঝাপড়া গড়ে তুলছে, তার বিপরীতে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষও সারা পৃথিবীতে সোচ্চার হচ্ছে। প্রয়োজন, সঠিক সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতির ভিত্তিতে এইসব প্রতিবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করা।

ডাক্তারি ছাত্রদের উপর ফতোয়া

তিনের পাতার পর

কিন্তু রোগীর থেকে দূরে বসে শুধু থিওরি মুখস্ত করে ডাক্তারি শেখা যায় কি? এই নেক্সট পরীক্ষায় কেউ অকৃতকার্য হলে তাকে ছয় মাস অপেক্ষা করতে হবে পরের পরীক্ষার জন্য, এখন কিন্তু দেড় মাসের মধ্যে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিয়ে ইন্টার্নশিপ শুরু করবার সুযোগ ছিল। একজন গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্র বা ছাত্রী যখন ফাইনাল ইয়ার শেষ করতে যায়, তার দিকে তাকিয়ে থাকে তার পরিবার—কবে সে ইন্টার্নশিপ শুরু করে উপার্জন শুরু করবে। এই অবস্থায় ছয় মাস অপেক্ষার কথা বলা অত্যন্ত অমানবিক। এই ব্যবস্থায় ভবিষ্যত ডাক্তারদের হতে কলমে কাজ জানার অভিজ্ঞতা কমবে বলে আশঙ্কা। এর ফল ভুগবে দেশের সাধারণ মানুষ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডাক্তারি শিক্ষা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট নতুন নয়। কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, তিন বছরের ডিপ্লোমা ডাক্তার এবং পনেরো দিনের নার্স তৈরি করবেন। তীব্র আন্দোলন শুরু হওয়ায় এবং তার প্রতিক্রিয়া পঞ্চায়েত ভোটে পড়তে পারে ভেবে রাজ্য সরকার আর এগোয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে মেডিকেল শিক্ষায় ন্যক্কারজনক ভাবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীদের পাশ করানোর জন্য পরীক্ষার সময় বই বা মোবাইল দেখে লেখানো, টুকলি সাপ্লাই করা, পরীক্ষকদের হুমকি দেওয়া ইত্যাদি চলছে। এই দেখে অনেকে বিভ্রান্ত হচ্ছেন যে, নেক্সট-এর মতো সর্বভারতীয় পরীক্ষা হলে বুঝি দুর্নীতি দূর হবে। আগে রাজ্যে রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্সগুলি তুলে দিয়ে যখন নিট পরীক্ষা চালু হয় তখনও এই কথা আমরা শুনেছি। এরপর বহুবার নিট ইউজি এবং পিজি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস এবং কর্পোরেট কোচিং ইন্ডাস্ট্রির সাথে এদের যোগসাজসের বহু অভিযোগ দুর্নীতিমুক্ত কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফানুস ফাটিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় দুর্নীতির দূর হবার বদলে তার কেন্দ্রিকরণ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। যার ফল নেবে তৃণমূলের বদলে বিজেপির নেতাকর্মীরা আর নেবে কোচিং সেন্টারগুলো।

এই অগণতান্ত্রিক এবং চরম জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র ডাকে দেশের মেডিকেল ছাত্র সমাজ আন্দোলনে ফেটে পড়েছে। এই নেক্সট পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে সংগঠন ১-৭ জুলাই প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের ডাক দেয়। ১ জুলাই (ডক্টর্স ডে-র দিন) কলেজে কলেজে এনং রাজ্যস্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। এর পর স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে সাড়া দিয়ে যেখানে দেশের ৩০টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে মেডিকেল ছাত্রছাত্রীরা এআইডিএসও-র নেতৃত্বে আন্দোলনের পক্ষে সই দিয়ে প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছে। ৭ জুলাই এনএমসি অফিসে সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সেই স্বাক্ষর জমা দেওয়া হয়। মেডিকেল ছাত্রদের মধ্যে এই বিশাল সমর্থন খুবই আশাব্যঞ্জক।

আন্দোলনে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের এই বিপুল অংশগ্রহণে ভীত হয়ে ইতিমধ্যেই এনএমসি ঘোষণা করেছে নেক্সট পরীক্ষায় তিনটি অ্যাটেম্পট এর অ্যাভারেজ স্কোর রাখা হবে না। এটা আন্দোলনের একটা বড় জয়। এরপর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডিয়া গত ৬ জুলাই ঘোষণা করেন, ২০১৯ ব্যাচের ছাত্রদের নেক্সট পরীক্ষা দিতে হবে না। এছাড়াও তিনি ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে, ফাইনাল এমবিবিএস পরীক্ষা আগের মতোই থাকবে, নেক্সট দিতে হবে ইন্টার্নশিপের পর রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার জন্য। কিন্তু আজও পর্যন্ত (৯ জুলাই) এনএমসি থেকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার স্বপক্ষে কোনও নোটিশ বেরোয়নি, যা দেশজোড়া ছাত্রদের মনে ব্যাপক অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে দেশের সাধারণ মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের এই বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে নেক্সট পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে বাতিলের দাবিতে এবং মেডিকেল শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ রুখে দিতে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে আহ্বান জানানো হয়।

মণিপুরের আগুন নেভাতে চান না

একের পাতার পর

সে। বিদ্বেষের বিষে অন্ধ জনতা আহত এক সাত বছরের বালককেও পুড়িয়ে মারতে ইতস্তত করেনি। মণিপুরের মতো শান্তিপ্রিয় রাজ্যে এমন পরিবেশ তৈরি হল কী করে?

ইতিমধ্যে আর এক কু-নাট্য দেখেছে দেশ— মণিপুরের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং হঠাৎ পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে ৩০ জুন রাজভবনে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন। দেখা গেল সরকার সমর্থক মহিলা বাহিনী তাঁর পথ আটকাল, বিজেপির এক এমএলএ পদত্যাগপত্র প্রকাশ্যে ছিঁড়ে ফেলে তাঁকে পদত্যাগ থেকে বিরত করলেন। কিন্তু এই 'হঠাৎ' সিদ্ধান্তের কথা মহিলারা আগেই জানলেন কী করে? না জানলে পদত্যাগ না করার আবেদন জানানো ব্যানার তৈরি করে তাঁরা খুব সকালেই পৌঁছে যেতে পারলেন কী করে? ব্যাপারটা যে একেবারেই সাজানো, বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি।

স্বার্থ আছে বৃহৎ পুঁজির

কিন্তু যে প্রধানমন্ত্রী রোজ একাধিক টুইট করেন, তিনি মণিপুরের ব্যাপারে মুখে তালা লাগিয়েছেন কেন? কেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগের নাটক করতে হচ্ছে? মণিপুরের ঘটনাবলি একটু খুঁটিয়ে দেখলেই কারণটা পরিষ্কার হয়ে যায়। আজ মণিপুরের কুকি কিংবা মেইতেই সব সম্প্রদায়ের মানুষ এই জাতিদাঙ্গার জন্য বিজেপি সরকারকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন। একদিকে বিজেপির ভোট রাজনীতির স্বার্থে জাতিসংঘর্ষে উস্কানি দেওয়া, অন্য দিকে বৃহৎ পুঁজিমালিকদের স্বার্থে মণিপুরের পাহাড়ের জঙ্গল, জমি থেকে আদিবাসীদের হঠানো, এই দুই ষড়যন্ত্র মিলে মণিপুরের মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। সম্প্রতি ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত যেভাবে মণিপুরের জন্য চোখের জল ফেলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের স্বার্থবাহী 'লুক ইস্ট' নীতির পক্ষে সওয়াল করে মণিপুর হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাস্তা খোলার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তাতে মণিপুরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিজেপির মদতপুষ্ট 'এথনিক ক্লিনসিং'-এর কারণ নিয়ে সন্দেহ আরও দানা বেঁধেছে।

ভোটব্যাঙ্কের জন্য সর্বনাশা রাজনীতি

মণিপুরের উপত্যকা অঞ্চলে বসবাসকারী মেইতেইরা জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ। মূলত পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা কুকি গোষ্ঠীভুক্ত জো, হমার, চিং ইত্যাদি জনজাতিরা ২৮ শতাংশ, বাদবাকি নাগা সহ অন্যান্যরা। বিজেপি দেখেছে মণিপুরের রাজ্য সরকারের গদি দখল করতে হলে তাদের মেইতেইদের ত্রাতা সাজতে হবে। তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংকে সামনে রেখে বিজেপি সেই কাজটাই করতে চেয়েছে। এ জন্য তারা মেইতেইদের মধ্যে পাহাড় নিবাসী জনজাতি বিশেষত কুকিদের বিরুদ্ধে উগ্র প্রচার চালিয়েছে দীর্ঘদিন। অন্য দিকে কুকি সংগঠনগুলি বলেছে গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি মানবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলে ভোট কিনেছে। অথচ এখন কুকি গোষ্ঠীভুক্ত সকল জনজাতির গায়ে বিজেপি একতরফাভাবে বহিরাগত তকমা দেগে দিয়েছে। মণিপুরের ৬০ আসনের বিধানসভায় ৩৯টি আসন উপত্যকার ভাগে পড়ছে। পাহাড়ে মাত্র ১১টি, তার ১০টি জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। ভারতভুক্তির পর থেকে যতজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তাঁরা সকলেই উপত্যকাবাসী মেইতেই গোষ্ঠীর। পাহাড়ি জনজাতির সামান্য কিছু জন এসটি তকমার সুযোগে শিক্ষা এবং চাকরির নাগাল পেলেও বিরাট অংশের মানুষ পুরোপুরি বঞ্চিত। মেইতেইদের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকলেও এই গোষ্ঠীর সাধারণ মানুষের দারিদ্র, বেকারত্ব ভয়াবহ। বিজেপি মেইতেইদের বোঝাতে চেয়েছে এসটি তকমা পেয়ে গেলে মেইতেইরা চাকরি পাবে, দামি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুযোগ পাবে, তাদের জমি সমস্যারও সমাধান হবে। এই কারণে মণিপুর হাইকোর্টের মামলায় রাজ্য সরকার এমন ভূমিকা নেয় যে, মেইতেই জনগোষ্ঠীকে এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়ার রায় পেয়ে যায় তারা। যার সমালোচনা সুপ্রিম কোর্টও করেছে। মণিপুরের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে দারিদ্র এতটাই বেশি যে, এইটুকু আশা দেখিয়েই বিজেপি মেইতেইদের উন্মত্ত করে তুলতে পেরেছে। অন্যদিকে কুকিদের যেটুকু আছে তা হারানোর ভয় দেখিয়ে তাদেরও খেপিয়ে তুলতে সফল হয়েছে। বিজেপি চেয়েছে কুকি এবং মেইতেইদের মধ্যে এমন পরিবেশ তৈরি করতে, যাতে তারা নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য একে অপরকে দায়ী করে। চেয়েছে মেইতেইদের মধ্যে এক ধরনের বিপন্নতার বোধ সৃষ্টি করে তাদের কুকিদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে। এই জন্য ২০১৭-তে ক্ষমতায় বসার আগে থেকেই তারা আওয়াজ তুলছে, কুকিরা সবাই অনুপ্রবেশকারী। সমস্ত কুকি গ্রামকেই তারা বেআইনি আখ্যা দিচ্ছে। ভারতীয় নাগরিক কুকিদেরও বিজেপি মায়ানমার থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী এবং বেআইনি ড্রাগ ব্যবসায়ী হিসাবে দেখাচ্ছে।

জনগণের কাঠগড়ায় বিজেপি সরকার

বিজেপি সরকারের এই ভূমিকা দেখে মণিপুরের নাগরিক সমাজের 'অভিভাবক' হিসাবে পরিচিত মহিলাদের সামাজিক সংগঠন 'মেইরা পাইবিস' মেইতেই যুবদের লড়াইয়ে পাঠানো এবং তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য রাজ্যের বিজেপি সরকারকেই দায়ী করেছে। দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকার সাংবাদিকের কাছে আধাসামরিক বাহিনীর এক অফিসার বলেছেন, ৩ মে থেকে শুরু করে জুন মাসের মধ্যেই ২০০-র বেশি কুকি গ্রাম উচ্ছেদ করেছে সরকারের মদতপুষ্ট মেইতেইদের সশস্ত্র বাহিনী। এর জন্য মেইতেই জঙ্গিগোষ্ঠী 'মেইতেই লিপুন' এবং 'আরামবাই তেঙ্গল'-এর হাতে অস্ত্র তুলে দিতে সরকার সাহায্য করেছে পরোক্ষে। তারা পুলিশ বা আধাসামারিক বাহিনীর অস্ত্রাগার লুঠ করলেও পুলিশ বাধা দেয়নি।

২৭ মার্চ হয়েছিল হাইকোর্টের রায়, তা নিয়ে কুকিদের বিক্ষোভও ছিল, দাঙ্গা তো লাগেনি! এরপর এক মাসের বেশি সময় পার করে ৩ মে এসে দাঙ্গা শুরু হল কেন? তথ্য বলছে, চূড়াচাঁদপুরে ৩ মে অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ডাকে আদিবাসী ছাত্রদের মিছিলে আরামবাই তেঙ্গল যে হামলা চালাতে চলেছে, তা সরকার এবং পুলিশের অজানা ছিল না। কিন্তু তারা কোনও পক্ষকেই আটকানোর চেষ্টা করেনি। এরপর একের পর এক চার্চে আগুন লাগিয়ে বিষয়টাকে হিন্দু বনাম খ্রিস্টান করে তুলতেও চাওয়া হয়েছিল। মণিপুরের এক শিক্ষাবিদকে উদ্ধৃত করে দ্য টেলিগ্রাফ ১ জুলাই লিখেছে, বিজেপি মেইতেই ঘরের মায়েদের বুঝিয়েছিল— কুকিদের হাতে উপত্যকার সব জমি, চাকরি দখল হয়ে যাবে, এই পরিস্থিতিতে তাদের সন্তানদের স্বার্থেই ছেলেদের পাঠাতে হবে কুকিদের বিরুদ্ধে লড়তে, পুলিশ পিছন থেকে সাহায্য করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কুকিরাও সশস্ত্র। তাদের যেমন প্রাণ যাচ্ছে, তেমনই তাদের গ্রামরক্ষী বাহিনীর হাতে মেইতেই যুবকরাও প্রাণ হারাচ্ছেন। ফলে মেইতেই মায়েরা এখন বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় তুলছেন তাঁদের সন্তানকে বলি দেওয়ার জন্য।

সবেতেই কংগ্রেসের অনুসারি বিজেপি

বিজেপির বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংকে মেইতেই জাতিসত্তার প্রতীক হিসাবে তুলে ধরে বিজেপি প্রচার চালিয়েছে। রাজ্যের সরকারের প্রধানের সাম্প্রদায়িক এই ভূমিকা দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ বাড়াতে আরও বেশি করে সাহায্য করেছে। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাম্প্রতিক সফর দেখিয়ে তাঁকে এখন মণিপুরের ত্রাতা সাজানোর চেষ্টা একদল করছে। যদিও বীরেন সিং মুখ্যমন্ত্রিত্বে বসার মাত্র পাঁচমাস আগে ছিলেন রাজ্য কংগ্রেসের সহসভাপতি। মোদিজির 'কংগ্রেস মুক্ত ভারত' স্লোগানের অপূর্ব রূপায়ণ বটে! ১৯৪৯-এ মণিপুরের ভারতভুক্তির পর থেকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারে বেশি সময় থেকেছে কংগ্রেস। ২০১৭ থেকে রাজ্য সরকারে আছে বিজেপি। এই উভয় দলই মণিপুরের সাধারণ মানুষের সাথে কার্যত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সংবিধানের ৩৭১সি ধারায় মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাহাড় থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মত নেওয়া আবশ্যিক। আদিবাসীদের জমি তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মত ছাড়া বহিরাগত কারও কাছে বিক্রি বা লিজে দেওয়া যায় না। কুকিদের ঐতিহ্য অনুযায়ী জমির ওপর অধিকার গোষ্ঠীগত, ব্যক্তিগত নয়। নাগা গোষ্ঠীগুলিরও অধিকাংশ জমি গোষ্ঠীগত মালিকানায়, তাদের কিছু ব্যক্তিগত জমিও আছে। ১৯৬০-এর মণিপুর ল্যান্ড রেভিনিউ অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্ম আইনে বনজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ওপর মণিপুরে স্থায়ী বাসিন্দাদের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যের কংগ্রেস সরকার ১৯৮৮ এবং ২০১৫ তে দু'বার চেষ্টা করে জমি আইনে বদল এনে পাহাড়ি অঞ্চলেও আদিবাসীদের জমির ওপর বহিরাগত বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দিতে। উল্লেখ্য ২০১৫-তে রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের এই আইনের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এখন বিজেপি বনাঞ্চলে আদিবাসীদের অধিকারকে সম্পূর্ণ বাতিল করতে সচেষ্ট সারা ভারতেই। মণিপুরেও সব বনাঞ্চলকে তারা রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা করে আদিবাসীদের উচ্ছদ চাইছে। এই কাজটি এবং বিজেপি যে কুকিদের নতুন গ্রামগুলিকে অনুপ্রবেশকারীদের গ্রাম বলে দাগিয়ে দিতে চাইছে এই কাজটাও শুরু করে গেছে কংগ্রেস। কুকি গোষ্ঠীগুলির রীতি হল পাহাড়ে মাঝে মাঝেই নতুন গ্রাম পত্তন করে পুরনো গ্রাম ছেড়ে যাওয়া। এ ছাড়া ১৯৯৩-এ নাগা-কুকি দাঙ্গার পর তারা নতুন ৩৬০টি ছোট বসতি নতুন করে স্থাপন করেছে তা সরকারের অজানা নয়। সরকারের আরও জানা আছে, মিজোরাম, ত্রিপুরা এমনকি মায়ানমার ও বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পাহাড়ে ছড়িয়ে থাকা কুকি ট্রাইবদের পরস্পরের সাথে নিবিড় যোগাযোগ আছে। মায়নমারে অশান্তির ফলে সেখান থেকে কিছু শরণার্থী মণিপুরের পাহাড়ে এসেছেন এটাও সত্য। কিন্তু তাদের সাথে সমগ্র কুকি জনগণকে বহিরাগত বলে দাগিয়ে দেওয়া কোনওমতেই চলে না। বিজেপি এই কাজটা করছে অশান্তি তৈরির জন্যই।

বিজেপির 'ভিশন-৪৭ আসলে কর্পোরেট পুঁজির দৃষ্টিভঙ্গি

বীরেন সিং বিজেপিতে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদ লাভ করার পর কংগ্রেসের আনা জমি আইনের পথেই চলেছেন। তিনি নরেন্দ্র মোদির অনুগামী হিসাবে 'ভিশন ২০৪৭' আনবার জন্য এখন ব্যস্ত। সেই ভিশনে পাহাড়ে গোষ্ঠীগত জমির মালিকানা ভেঙে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে চায় বিজেপি। তারা প্রচার করছে এর উদ্দেশ্য— কুকিদের জমির মালিক হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। অন্য দিকে মেইতেইদের এসটি তকমা পাইয়ে দিয়ে তাদের সুবিধা করে দেবে বলে বিজেপি যে প্রচার করছে, তার অন্যতম একটা প্রচার হল পাহাড়ে অ-আদিবাসীদের জমি কেনার সুযোগ করে দেওয়া। দরিদ্র মেইতেই জনগণ যাদের অধিকাংশই কৃষিকাজ ও মাছধরার কাজে দিবারাত্র ব্যস্ত থাকে, তারা দলে দলে জমি কেনার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে এই গল্প কি সহজে কেউ বিশ্বাস করবে? আসলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে চিনের সাথে টক্কর দিয়ে মাল বিক্রি করতে মণিপুরের জমি কর্পোরেট কোম্পানির মালিক বৃহৎ পুঁজিপতিদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাদের দরকার এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ বনজ ও খনিজ সম্পদের ওপর থাবা বসানো। আরও জমি দরকার ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিমালিক ও মার্কিন একচেটিয়াদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে। সাম্রাজ্যবাদী চিনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' বা 'ওবর'-এর সাথে টক্কর দিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাজারে ঢোকার জন্য ভারতীয় একচেটিয়া মালিকদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজি চেষ্টা করছে 'লুক ইস্ট' নাম দিয়ে মণিপুর হয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ করতে। তার জন্য মণিপুরের আদিবাসীদের জমি থেকে সরানোর পরিকল্পনা তাদের আছে। এই সব মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় মণিপুরের দুই গোষ্ঠীর খেটে খাওয়া মানুষের লড়াইতে ফয়দা আছে বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর। তাদের সেবাদাস বিজেপিও ভোটের ফয়দা দেখেছে। সে জন্যই কি নীরব থেকে আগুন জ্বলতেই দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি!

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

শরণার্থী শিবিরে ইজরায়েলের বর্বর আক্রমণের তীব্র নিন্দা

ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইজরায়েলের জেনিন শরণার্থী শিবিরে বর্বর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৪ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন,

আমেরিকার মদতপুষ্ট ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইজরায়েলি বাহিনী জেনিন শরণার্থী শিবিরে যে নৃশংস এবং বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বর্বর আক্রমণ করেছে আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। জেনিন শরণার্থী শিবির ১৯৫০ এর দশকে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের এক প্রান্তে গড়ে ওঠে এবং প্রায় ১১ হাজার গৃহহীন প্যালেস্টিনীয় সেখানে আশ্রয় নেন। ইজরায়েলের এই আক্রমণে শিশু সহ অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু মানুষ গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছে বহু শিশু ও কিশোর-কিশোরী। গত এক বছরে প্রায় ১৩৩ জন প্যালেস্টিনীয় মানুষের মৃত্যু হয়েছে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এলাকায়। ইজরায়েলি সৈন্য ওই এলাকায় বিগত এক বছর ধরে ক্রমাগত আক্রমণ বাড়িয়ে এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করে ইজরায়েলের দখল করা প্যালেস্টাইন অঞ্চলের বাসিন্দাদের যন্ত্রণা আরও শোচনীয় করে তুলছে। আমরা বিশ্বের সকল শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, ইজরায়েলের নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন এবং বিশ্ব জনমতের চাপে ইজরায়েলকে প্যালেস্টাইনের জনগণের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে বাধ্য করুন।

পুনর্নির্বাচনেও সন্ত্রাস

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলী ব্লকের দেউলবাড়ি দেবীপুরে কাছারিমাঠ এফ পি স্কুলের ২টি বুথে ও জয়নগর-২ ব্লকের ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা এফ পি স্কুলের ৩টি বুথে ১০ জুলাই পুনর্নির্বাচন হয়। দু'টি ব্লকেই আগের রাত থেকে পাড়ায় পাড়ায় মুড়ি-মুড়কির মতো বোমা পড়ে, প্রার্থী ও এজেন্টের বাড়িতে ঢুকে সশস্ত্র বহিরাগত গুন্ডারা ভয় দেখায়, বুথে গেলে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। সাধারণ ভোটারদের বাড়িতে গিয়েও একইরকম ভাবে তারা ভয় দেখায়। ফলে অনেককেই অন্য জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়। সকাল থেকে রাস্তার সমস্ত মোড়ে বহিরাগত সশস্ত্র গুন্ডারা পাহারা দিতে থাকে, যাতে ভোটার ও প্রার্থী বা এজেন্ট আসতে না পারেন। এই হুমকি উপেক্ষা করে এস ইউ সি আই (সি) -র এক এজেন্ট বটতলা স্কুলের একটি বুথে গেলে গুন্ডারা জোর করে তাঁকে বের করে দেয়। বুথের বাইরে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও তাদের ঘিরে থাকা গুন্ডাবাহিনীর বলয় ভেদ করে কোনও ভোটার ভিতরে আসতে পারেননি। অবাধে ছাপ্পা দিয়ে ভোট শেষ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতেই ভোট প্রহসনে পরিণত হয়।

বরুণ বিশ্বাস স্মরণ

সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক স্মরণীয় চরিত্র শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস। সিপিএম আমলে উত্তর ২৪ পরগণার গোবরডাঙা, গাইঘাটা, সুটিয়া, ঠাকুরনগর অঞ্চলগুলিতে চোরাচালান, অবৈধ মাছের ভেড়ি, বেআইনি ইটভাটা ইত্যাদি নিয়ে একটা শক্তিশালী অপরাধগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ডাক দেন বরুণ বিশ্বাস সহ অন্যরা। গড়ে ওঠে সুটিয়া প্রতিবাদী মঞ্চ। সরকার বদলালেও অপরাধ চলতে থাকে। ২০১২ সালের ৫ জুলাই সন্ধ্যায় গোবরডাঙা স্টেশনে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে সমাজবিরোধীরা।

বরুণ বিশ্বাস সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা 'শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ'-র উত্তর-মধ্য কলকাতা শাখার অন্যতম সংগঠক ছিলেন, যুক্ত ছিলেন 'সেভ এডুকেশন কমিটি'র সাথেও।

গত ৫ জুলাই 'বরুণ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি' শ্রদ্ধায় এই সংগ্রামী চরিত্রকে স্মরণ করে। বরুণ বিশ্বাসের স্কুল শিয়ালদা মিত্র ইনস্টিটিউশনের সামনে স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের যুগ্ম সম্পাদক সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, কমিটির সহ সম্পাদক ও শিক্ষক অনাথ মৃধা, আবৃত্তিশিল্পী রণেন্দ্রনাথ ধাড়া এবং কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি প্রাক্তন শিক্ষক তপন সামন্ত। হুগলির পশ্চিম শিকটা, উত্তরপাড়া, ঝাড়গ্রাম, লালগোলা, রানাঘাট, বনগাঁ, সুটিয়া, মথুরাপুর, গড়িয়া, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের উদ্যোগে এসপ্ল্যানেডে, টিআইএফআর হায়দরাবাদ সহ নানা স্থানে বরুণ বিশ্বাস স্মরণে অনুষ্ঠান হয়।

জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবনের নাম পরিবর্তনের তীব্র নিন্দা

জাতীয় গ্রন্থাগারের 'ভাষা ভবন'-এর নাম পরিবর্তন করার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৬ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য করণীয় কিছুই না করে, এই গ্রন্থাগারের 'ভাষা ভবন'-এর নাম বদল করার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব নেই। নাম বদলের সময় প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন— যাঁরা প্রকৃতই ভাষাবিজ্ঞানে অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের পুরোপুরি বাদ দিয়ে কেন্দ্রের সংস্কৃতি মন্ত্রক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী, স্বাধীনতা আন্দোলন বিরোধী এবং ধর্মের ভিত্তিতে বিদ্বেষ ও বিভাজন সৃষ্টির প্রবক্তা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে নামকরণ করল। এর মধ্য দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাদের হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকেই আরও প্রকট করল।

এর আগেও জাহাজ বন্দরের উন্নতির প্রতি মনোযোগ না দিয়ে নেতাজি সুভাষ ডক নামে যা পরিচিত ছিল, তার পরিসর সংকুচিত করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামেই জাহাজ বন্দরের নামকরণ করা হয়েছে। বিজেপির হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক অ্যাজেন্ডা পূরণ করার প্রয়োজনে অনৈতিহাসিক ভাবে এই নাম বদলের আমরা তীব্র নিন্দা করছি।

এআইডিএসও-র প্রতিবাদ ঃ ভাষা ভবনের নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় ৬ জুলাই বলেন, জাতীয় গ্রন্থাগারে নিয়মিত পাঠকরা প্রতিদিন যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হন— যেমন পর্যাপ্ত পরিমাণ বই না থাকা, সমসাময়িক বই না কেনা, গবেষণা জার্নালগুলোর সাবস্ক্রিপশন না থাকা, দুর্বল ইন্টারনেট পরিষেবা, পানীয় জলের সমস্যা, এক-তৃতীয়াংশ কর্মী দিয়ে গ্রন্থাগার পরিষেবা যখন প্রায় অচল হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে, তখন এই সমস্যার সমাধান না করে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাছে ভাষা ভবনের নাম পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ল। নিয়মিত পাঠকদের কাছে এ এক উদ্বেগের বিষয়। আমরা সরকারের এই জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রাক্তন বিচারপতি! প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়োগের তীব্র বিরোধিতা করে এআইডিএসও-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় এক বিবৃতিতে বলেন— রাজ্যপাল কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছিলেন, ছাত্ররাও অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হতে পারবেন। ৫ জুলাই রাজ্যপাল প্রাক্তন বিচারপতিকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে নিয়োগের কথা বলেছেন। গোটা রাজ্যে প্রায় ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নেই। রাজ্য সরকার কিংবা রাজ্যপাল উভয়েই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পঠন-পাঠনের কথা ভেবে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন না।

এই অবস্থায় অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে যাঁদের নিয়োগ করা হচ্ছে তাঁদের নিয়েও নানা রকমের জটিলতা দেখা দিচ্ছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে রাজ্যপাল যাঁকে মনোনীত করেছেন তিনি যে বিজেপি এবং আরএসএস ঘনিষ্ঠ, তা কর্ণাটক হাইকোর্টের বিচারপতি থাকা অবস্থায় প্রমাণিত হয়েছে। সেই বিচারপতিকে রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার একদিকে উপাচার্যের মতো উচ্চশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটিকে যেমন লঘু করছেন, তেমনি অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার পরিবর্তে হিন্দুত্ব প্রচারের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন। এ রাজ্যের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য অধ্যাপক থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্য থেকে উপাচার্য নিয়োগ না করে প্রাক্তন বিচারপতিকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ কোনও ভাবেই মানা যায় না। যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্থায়ী উপাচার্য না থাকায় প্রশাসনিক কাজ সঠিক সময়ে হচ্ছে না, পরীক্ষার মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশ সহ অন্যান্য বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে খুবই অবহেলিত হচ্ছে তখন প্রয়োজন ছিল স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউজিসি-র যে গাইডলাইন তাতে বলা হয়েছে উপাচার্য হতে গেলে কমপক্ষে ১০ বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অধ্যাপকরাই অতীতে উপাচার্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। রাজ্যপালের এই বিবৃতি ইউজিসির সেই গাইডলাইন বিরোধী, এতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতি হবে এবং শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com